মুফতী তকী উসমানীর মীলাদ বিরোধী ফতোয়ার রদ

মূলঃ ড.জিঁ এফ.হাদ্দাদ দামেশ্কী

অনুবাদ ঃ কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد و على آله و صحبه و بارك و سلم

আসুন সৎকার্মের প্রতিযোগিতা করি

মুফতী তকী উসমানীর মীলাদবিরোধী ফতোওয়ার রদ

মূল: ড: জি, এফ, হাদ্দাদ দামেশকী

অনুবাদ: কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন

অনুবাদকের উৎসর্গ:

আমার পীর ও মুরশেদ চট্টগ্রাম বোয়ালখালীস্থ আহলা দরবার শরীফের সৈয়দ মওলানা এ,জেড, এম, সেহাবউদ্দীন খালেদ আল-কাদেরী আল-চিশ্তী সাহেব কেবলা (রহ:)-এর পুণ্য স্মৃতিতে উৎসর্গিত।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

‘আতিউল্লাহা ওয়া আতিউর্ রাসূলা ওয়া উলিল আমরে মিনকুম’ (আল্লাহকে মান্য করো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মান্য করো, এবং তোমাদের মধ্যে যাঁরা সম্মানিত আদেশদাতা তথা বুযূর্গানে দ্বীন আছেন, তাঁদেরকেও মান্য করো)। [আল-কুরআন]

‘তোমাদের মধ্যে কেউ ঈমানদার হতে পারবে না, যতোক্ষণ না আমি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তোমাদের আপন সত্তার চেয়ে তোমাদের কাছে প্রিয় হই।’ [সহীহ আল-বুখারী]

মুফতী তকী উসমানী সম্পর্কে http://www.albalagh.net/taqi.shtml শিরোনামের একটি ওয়েবসাইটে ইংরেজিতে এক পাতা উৎসর্গিত হয়েছে এভাবে – “(তিনি) বর্তমান যুগের নেতৃস্থানীয় ইসলামী পণ্ডিতদের মধ্যে অন্যতম। চল্লিশেরও বেশি গ্রন্থের প্রণেতা, মুফতী সাহেব ইসলামী আইন, অর্থনীতি ও হাদীস শাস্ত্রে একজন বিশেষজ্ঞ। বিগত ৩৫ বছর ধরে তিনি করাচীর (পাকিস্তানের) দারুল উলূম (কওমী) মাদ্রাসায় পড়াচ্ছেন, যে মাদ্রাসাটি তার পিতা পাকিস্তানের মৃত গ্রান্ড মুফতী মোহাম্মদ শফীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আইন শাস্ত্রেও তার সনদ আছে এবং তিনি পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের শরীয়া এপেলেট বেঞ্চে একজন বিচারকও। বেশ কিছু আন্তর্জাতিক ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানে তিনি কনসালটেন্ট হিসেবে দায়িত্বরত এবং সুদবিহীন ব্যাংকিং ও ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। তিনি অরগানাইজেশন অফ ইসলামিক কনফারেন্স (ও,আই,সি,)-এর জেদ্দাভিত্তিক ফেকাহ কাউন্সিলের ডেপুটি চেয়ারম্যান।”

মুফতী তকী উসমানীর মীলাদবিষয়ক ফতোওয়া ইংরেজিতে প্রকাশ করা হয়েছে http://www.albalagh.net/sunnah_and_bidah/rabi-ul-awwal.shtml শীর্ষক অপর এক ওয়েব-পেজে।

শেষোক্ত পাতাটিতে ২০০০ সালের ১১ই জুলাই তারিখে প্রকাশিত মুফতী সাহেবের মন্তব্য থেকে আমি নিম্নের উদ্ধৃতিগুলো চয়ন করেছি ওই পাতায় সাজানো ক্রম অনুসারেই। সহজে মনোযোগসহ পাঠ ও রেফারেন্সের জন্যে আমি সেগুলোকে নম্বরযুক্ত করেছি। প্রতিটি উদ্ধৃতিশেষে আমি প্রয়োজন-মাফিক মন্তব্য যোগ করেছি, যা নসীহতের নবী (দ:)-এর দ্বারা আমাদের প্রতি আরোপিত দায়িত্ব ও কর্তব্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, যে দায়িত্ব হলো আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য ও মুসলমানদের প্রতি নিষ্ঠাপূর্ণ সুপরামর্শ দান।

আমার এই সব মন্তব্য আল্লাহতা'লার মহা অনুগ্রহে আমাদের সুন্নী নকশবন্দী শুয়ূখ (পীর-মাশায়েখ)-বৃন্দের কাছ থেকে যা শিখেছি তার আলোকে লেখা হয়েছে। আল্লাহ তাঁদের দীর্ঘ জীবন ও সুস্বাস্থ্য দান করুন, আমীন। এঁদের মধ্যে সবার অগ্রে আছেন মওলানা শায়খ নাযিম আল-হাক্কানী সাহেব যিনি মুফতী তকী উসমানীর এই ফতোওয়ার বহু ভ্রান্ত ধারণা ও অপব্যাখ্যার জবাবে অতি প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণের সূত্রপাত করেন।

মুফতী তকী উসমানীর মীলাদবিরোধী এই ফতোওয়া কতোটুকু তথ্য ও ইসলামী দলিল, তথা কুরআন, সুন্নাহ, এজমা ও কেয়াস-নির্ভর, তা সরাসরি যাচাই-বাছাই করার ভার পাঠকদের ওপরই ছেড়ে দেয়া হলো। আল্লাহতা'লা এই লেখার মূল উদ্দিষ্ট সত্তা সাইয়্যেদুনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি অব্যাহত আশীর্বাদ ও শান্তি বর্ষণ করুন; এবং তাঁকে ওসীলা ও মানব জাতির জন্যে শাফায়াতের সর্বোচ্চ মকাম মঞ্জুর করুন; তাঁর পরিবার-সদস্যবৃন্দ ও সাথীদের প্রতিও আশীর্বাদ ও শান্তি বর্ষণ করুন, আমীন।

মুফতী তকী উসমানী বলেন:

১/ – "ইসলামের ইতিহাসে রবিউল আউয়াল মাস সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা, এই মাস মহানবী (দ:)-এর বেলাদত (ধরণীর বুকে শুভাগমন) দ্বারা আশীর্বাদপুষ্ট।"

মন্তব্য: এ কথা সত্য। তবুও লেখক নিচে ১৭ নং উদ্ধৃতিতে তার এই বক্তব্যকে নিজেই রহিত করে দিয়েছেন এ কথা অস্বীকার করে যে ওই পবিত্র মাসে কোনো নির্দিষ্ট দিন-তারিখ ধার্য করে মীলাদুন্নবী (দ:) উদযাপন করা বৈধ; এরপর তিনি আরও অগ্রসর হয়ে এই দিন-তারিখ ধার্য

করাকে বর্জনীয় বেদআত (উদ্ভাবন) হিসেবে আখ্যা দেন। অতঃপর তিনি মীলাদুন্নবী (দ:) উদযাপনের জন্যে এই পুণ্যময় মাসকে বেছে নেয়ারও তীব্র সমালোচনা করেন!

২/ – "অতএব, মহানবী (দ:)-এর বেলাদত ছিল মানব ইতিহাসে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা।"

মন্তব্য: পবিত্র মীলাদুন্নবী (দ:)-এর বরকতময় রাত যে লায়লাতুল কদরের রাতের চেয়েও শ্রেষ্ঠ এবং বেশি তাৎপর্যপূর্ণ, মুফতী তকী উসমানীর এই বক্তব্য তারই স্বীকারোক্তি। বস্তুতঃ এই অভিমত (পূর্ববর্তী) কতিপয় মালেকী মযহাবের ইমামবৃন্দের, যা উদ্ধৃত হয়েছে আবুল আব্বাস আল-ওয়ানশারিসী (ইন্তেকাল-৯১৪ হিজরী) কৃত 'আল-মি'আর আল-মু'রাব ওয়াল-জামে' আল-মুগরেব ফী ফাতাওয়া-এ-আহল-এ-ইফ্রিকা ওয়াল আন্দালুস ওয়াল-মাগরেব' (১১:২৮০-২৮৫) শীর্ষক মালেকী ফতোওয়াসমূহের বিশ্বকোষে।

অনুরূপভাবে, মালেকী মযহাবের হাদীস শাস্ত্রজ্ঞ ও ইমাম সাইয়্যেদ শরীফ মোহাম্মদ ইবনে জা'ফর আল-কাততানী তাঁর 'আল-এয়ামন ওয়াল-এস'আদ বি মওলিদিন খায়রিল 'এবাদ' (২১ পৃষ্ঠা) পুস্তকে বলেন: "কোনো দ্বিধা বা সন্দেহ ছাড়াই পরিদৃষ্ট হয় যে মহানবী (দ:)-এর পবিত্র বেলাদত ও মে'রাজের রাত দুটো পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ। ....এই যখন অবস্থা, তখন এই দুই রাত (মীলাদ ও মে'রাজ)-কে প্রতি বছর আবর্তমান ঈদ উৎসবগুলোর ('ঈদ মিন আল-আ'এয়াদ') মতোই উদযাপন করা উচিত এবং নেক আমল ও (আধ্যাত্ম) সাধনার উদ্দেশ্যে নিবেদিত 'মওসেম' তথা আবর্তমান ধর্মীয় প্রথাগুলোর অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। বস্তুতঃ এই তারিখগুলোকে সম্মান ও ভাবগাম্ভীর্য সহকারে পালন করা উচিত; এগুলোতে কুরআন মজীদ তেলাওয়াত এবং এমন আমল পালন করা উচিত যা এগুলোর অশেষ ফযীলত ও মাহাত্ম্যে খুশি প্রকাশের নির্দেশক হয়; আর এর পাশাপাশি আল্লাহতা'লা যে নেয়ামত এ দুই রাতে বর্ষণ করেছেন তার প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশক হয়। শরীয়তের আইন একে অস্বীকার করে না, দূষণীয় সাব্যস্তও করে না; আর তা এই আমল পালনকারীদের প্রতি না কোনো রকম তিরস্কার করে, না নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।"

৩/ – "ইসলামী শিক্ষায় যদি জন্মদিন বা বার্ষিক অনুষ্ঠান (বার্ষিকী) পালনের অবকাশ থাকতো, তাহলে নিঃসন্দেহে অন্য যে কারো জন্মদিন পালনের চেয়ে মীলাদুন্নবী (দ:) উদযাপন অগ্রাধিকার পেতো। কিন্তু তা তো ইসলামী শিক্ষার প্রকৃতিবিরোধী।"

মন্তব্য: এটা শরীয়তের উসূল তথা মৌলনীতিমালা সম্পর্কে ওহাবীদের একটি ভ্রান্ত ধারণা, যা গোমারী মাশায়েখবৃন্দ খন্ডন করেছেন (২৩ নং উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য); অর্থাৎ, তরক তথা কোনো আমল পালন না করা ওর নিষিদ্ধ বা প্রশংসনীয় না হবার প্রমাণ নয়, যেহেতু মহানবী (দ:) তাঁর যাহেরী (প্রকাশ্য) জিন্দেগীতে সমস্ত প্রশংসনীয় বা অনুমতিপ্রাপ্ত আমল পালন করেন নি। প্রাথমিক যুগের সকল প্রজন্মের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। বরঞ্চ কোনো বিষয় শরীয়তে গৃহীত এবং সুন্নাহ কর্তৃক সমর্থিত কিনা তা পরিমাপের মাপকাঠি হলো কুরআন ও সুন্নাহ; যা এ দুটো দলিল দ্বারা সমর্থিত তাই গৃহীত, আর যা সমর্থিত নয় তা বর্জনীয়।

৪/ – " এ কারণেই ইহুদী, খৃষ্টান ও হিন্দু ধর্মমতের সাথে বৈসাদৃশ্যস্বরূপ ইসলাম ধর্মে খুব অল্প সংখ্যক উৎসব পালন করা হয়, যা'তে অন্তর্ভুক্ত গোটা বছর জুড়ে মাত্র দুটো ঈদ (ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা)।"

মন্তব্য: এই দুটো ঈদ শরীয়তে আদিষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে রূপক অর্থে অন্য কোনো ঈদ অনুমতিপ্রাপ্ত নয়। এর দৃষ্টান্ত হলো মহানবী (দ:) স্বয়ং জুমু'আ দিবস (শুক্রবার)-কে ঈদ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।

শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে একটি কবিতার ছত্র বহুল প্রচলিত, যা'তে বিবৃত হয়েছে -

" *জুমু'আর দিন, ঈদের দিন, আর কোনো প্রিয় বন্ধুর বেড়াতে আসার দিন*

এই তিনটি-ই হচ্ছে ঈদ যার জন্যে আমি মহাপ্রভুর দরবারে করি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, আমীন।"

বস্তুতঃ ইসলামী পঞ্জিকায় সকল বিশেষ দিনই একেকটি ঈদ; যেমন – যিলহজ্ব মাসের প্রথম ১০ দিন, আ'রাফাত দিবস (হজ্জে), আশুরার দিন, লাইলাতুল কদর (রমযান মাসের ২৭ তারিখের রাত), এবং মে'রাজের রাত যেটা আল-কুরআনের পরে মহানবী (দ:)-এর দ্বিতীয় সেরা মো'জেযা। কিন্তু এগুলোর সব কিছুর চেয়ে, এমন কি আদিষ্ট দুই ঈদের চেয়েও মীলাদুন্নবী (দ:)-এর দিবস মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতর ও অধিক গুরুত্ববহ। সাইয়্যেদ মোহাম্মদ আলাউইয়ী মালেকী (মক্কী) তাঁর 'হাওল আল-এহতেফাল বি যিকরা আল-মাওলিদ আন্ নববী আশ্ শরীফ' শীর্ষক ফতোওয়ায় (পৃষ্ঠা ৮-৯) বলেন: " আমরা কতোবার বলেছি যে আমাদের মহানবী (দ:)-এর মীলাদ কোনো ঈদ নয়, আমরা একে ঈদ হিসেবে বিবেচনাও করি না; কেননা তা ঈদের চেয়েও বড় এবং উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন।" ঈদ বছরে মাত্র একবার আবর্তিত হয়; কিন্তু তাঁর মীলাদ ও যিকর

এবং সীরাত-এর মূল্যায়ন ও বিচার-বিবেচনা নিশ্চয় চিরস্থায়ী এবং তা কোনো নির্দিষ্ট সময় বা স্থানে সীমাবদ্ধ নয়!"

৫/ – "এই দুই ঈদের তারিখগুলো ইসলামী ইতিহাসের মহান ব্যক্তিদের কারো জন্মদিনের সাথেই সম্পৃক্ত নয়; আর ঈদের দিনগুলোর উৎপত্তিকে ওই তারিখগুলোতে ঘটে যাওয়া ইতিহাসের কোনো বিশেষ ঘটনার সাথেও সম্পৃক্ত করা যায় না।"

মন্তব্য: আগেই বলা হয়েছে, ঈদ হবার জন্যে এমন কোনো শর্ত নেই যে তাকে কোনো জন্মদিনের সাথে সম্পৃক্ত হতেই হবে; এর বিপরীতে জন্মদিনের প্রকৃতিও কোনো দিবসকে ঈদ হিসেবে বিবেচিত হওয়া থেকে নিবারিত করে না। দ্বিতীয়তঃ ঈদের উৎসকে ওই তারিখে ঘটে যাওয়া কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করা যায় না মর্মে দাবিটি স্পষ্ট ভ্রান্তি বৈ কিছু নয়; কেননা তাফসীর গ্রন্থগুলো কুরআন মজীদে বর্ণিত হযরত ইবরাহীম (আ:) কর্তৃক নিজ পুত্র হযরত ইসমাইল (আ:)-কে কোরবানী করার এরাদা (ইচ্ছা) এবং এর পরিবর্তে আল্লাহর ইচ্ছায় দুম্বা কোরবানী হবার ঘটনাটির বিবরণে পূর্ণ।

৬/ – "দুই ঈদের প্রথমটি পালিত হয় রমযান মাসের রোযা পুরো করে, আর দ্বিতীয়টি ইসলামের চার বুনিয়াদের একটি পবিত্র হজ্জের শেষে পালিত হয়।"

মন্তব্য: আমরা ইতোমধ্যে বলেছি, হজ্জের শেষে যে ঈদুল আযহা পালিত হয়, তাফসীর গ্রন্থগুলোর ভাষ্যমতে তার সাথে ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পৃক্ত। আমরা আরও বলবো, রমযান মাসের শেষে যে ঈদুল ফিতর পালিত হয়, তারও একটা ঐতিহাসিক পটভূমি দিয়েছেন আল্লাহতা'লা যখন তিনি ঘোষণা করেন তাঁরই পাক কালামে, "রোযা তোমাদের প্রতি আদিষ্ট হলো, যেমনিভাবে বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি" (আল-আয়াত)। এতে পরিদৃষ্ট হয় যে আল্লাহতা'লা এই দুটো আজ্ঞাকে ঐতিহাসিক ভিত্তি ব্যতিরেকে জারি করেন নি, যে বিষয় সম্পর্কে মুসলমান সাধারণ ওয়াকেফহাল ও পর্যবেক্ষণকারী হবার কথা; ঠিক যেমনি ইহুদীদের আশুরা পালনের পরিপ্রেক্ষিতে মহানবী (দ:) এরশাদ ফরমান: "মূসা (আ:)-এর (ফেরাউন থেকে মুক্তির) স্মরণে ইহুদীদের চেয়ে আমরা বেশি হক্কদার।" অধিকাংশ উলামা-এ-কেরাম যাঁরা মীলাদবিষয়ক ফতোওয়া লিখেছেন, তাঁরা এই বিবরণকে মীলাদুন্নবী (দ:) উদযাপনের পক্ষে শরীয়তের দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

৭/ – "এই দুই ঈদের উৎসবের পদ্ধতি বা পন্থাও অনৈসলামী উৎসবের পদ্ধতি থেকে ভিন্ন। এতে কোনো আনুষ্ঠানিক মিছিল, আলোকসজ্জা কিংবা অন্যান্য আনুষ্ঠানিক খুশি প্রকাশক কার্যক্রম নেই।"

মন্তব্য: এই দুই ঈদ উৎসবের পদ্ধতি দুইটি শ্রেণীভুক্ত: শরীয়তের আইনে আরোপিত পন্থা এবং মানুষের অনুসৃত প্রথা বা রীতি। শেষোক্তটির কোনো নির্ধারিত আকার *নেই* এবং শরীয়তের মৌলনীতির পরিপন্থী নয় এমন সব কিছুই তাতে অন্তর্ভুক্ত *থাকতে পারে*। মিছিল, আলোকসজ্জা বা অন্যান্য আনুষ্ঠানিক আনন্দ প্রকাশক কর্মকান্ড আপনাআপনি শরীয়তের আইনের বরখেলাপ *নয়*।

৮/ – "ইসলাম ধর্ম কারো জন্মোৎসব উদযাপনের আদেশ দেয় না, তিনি যতো মহান বা গুরুত্বপূর্ণ-ই হোন না কেন। মানব জাতির মধ্যে আল্লাহর আম্বিয়া (আ:)-বৃন্দ হলেন সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। কিন্তু মহানবী (দ:) বা তাঁর সাহাবা-এ-কেরাম (রা:) কেউই নিজেদের জন্মোৎসব বা বার্ষিকী পালন করেন নি। এমন কি সমগ্র মানব জাতির জন্যে সবচেয়ে খুশির দিন হুযূর পাক (দ:)-এর জন্মদিবস তিনি নিজেই পালন করেন নি; তাঁর সাহাবী (রা:)-বৃন্দও তা উদযাপন করেন নি।"

মন্তব্য: 'ইসলাম কারো জন্মোৎসব উদযাপনের আদেশ দেয় না', এই প্রথম বাক্যটি সঠিক হলেও এখানে তো কেউই এটা দাবি করেন নি। পক্ষান্তরে, কারো জন্মোৎসব উদযাপন 'না' করার আদেশ ইসলাম ধর্ম দিয়েছে মর্মে দাবীটি একেবারেই ভ্রান্ত; অথচ এই দাবি-ই মীলাদবিরোধীরা উত্থাপন করে চলেছে। ওপরের উদ্ধৃতির বাকি অংশ সম্পর্কে আমাকে দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে তা ডাহা মিথ্যে। মহানবী (দ:) তাঁর জন্মদিন পালন করতেন প্রতি সোমবার রোযা রেখে; প্রাথমিক যুগের উম্মত-ও তাঁর সুন্নাতের অনুসরণে তা করতেন। এই নেক আমল পালনের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (দ:) ও পূর্ববর্তী পুণ্যবান মুসলমান সমাজ নূরনবী (দ:)-এর জন্মদিনকে মূল কারণ ও পরিচালনাকারী শক্তি হিসেবে বিবেচনা করতেন, যা প্রতিফলিত হয়েছে সহীহ হাদীস ও রওয়ায়াতে এবং যা বিধৃত হয়েছে ওই সকল বর্ণনার ভাষ্যকারদের লেখনীতে। এঁদের মধ্যে রয়েছেন ইবনে খুযায়মা ও তাঁর শিষ্য ইবনে হিব্বান নিজ নিজ সহীহ গ্রন্থে। আল্লাহ যাঁদেরকে দৃষ্টিশক্তি দিয়েছেন তাঁদের জন্যে এটাই প্রামাণ্য দলিল হিসেবে যথেষ্ট।

"[উপ-শিরোনাম:] এয়াওম আল-ইসনাইন (সোমবার)-এর রোযার ফযীলত আলোচনা, কেননা (লিয়ান্না) ওই দিন মহানবী (দ:)-এর বেলাদত (ধরাধামে শুভাগমন) হয়েছে এবং ওই দিনই তাঁর

প্রতি (প্রথম) ওহী (ঐশী বাণী) নাযেল তথা অবতীর্ণ হয়েছে।” [সহীহ্ ইবনে হিব্বান, আরনাওত সংস্করণ, ৮:৪০৩]

“এয়াওমে ইসনাইন-এর রোযার ফযীলত-বিষয়ক অধ্যায় – যখন (ইয়্) এই সোমবারে মহানবী (দ:)-এর বেলাদত হয়েছে, তাঁর প্রতি ওহী-ও নাযেল হয়েছে এবং ওই একই দিনে তিনি বেসাল (পরলোকে খোদার সাথে মিলন)-প্রাপ্তও হয়েছেন।” [সহীহ্ ইবনে খুযায়মা (আ’যামী সংস্করণ ৩:২৯৮)]

৯/ – “বস্তুতঃ আসমানী (ঐশী) কেতাবের সাথে নিজেকে সংশ্লিষ্টকারী কোনো ধর্মই মহান কারো জন্মদিন উদযাপনের আদেশ দেয় নি। এটা মূলতঃ পূর্ববর্তী অবিশ্বাসী বা দেব-দেবীর পূজারী (পৌত্তলিক) বিভিন্ন সমাজে প্রচলিত প্রথা ছিল। এমন কি বড়দিন (খৃষ্টমাস্) যা যীশু খৃষ্টের জন্মোৎসব, তা-ও বাইবেল কিংবা প্রাথমিক যুগের খৃষ্টান শাস্ত্রলিপিতে উল্লেখিত হয় নি।”

মন্তব্য: এখানে আমরা তিনটি ভুল দেখতে পাই। এর প্রথমটি, যেটি সবচেয়ে মারাত্মক ভুল, তাতে এই মুফতী কোনো ঐশী ধর্মেই মহান কারো জন্মোৎসব উদযাপনের বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। তার ভাবটি এই যেন তিনি কখনোই শোনেন নি যে মহানবী (দ:) ‘ইসরা’ তথা মেরাজ রজনীতে ঊর্ধ্বগমনের সময় বোরাক থেকে নেমে হযরত ঈসা (আ:) -এর জন্ম যেখানে হয়েছিল সেখানে নামায পড়েছিলেন; এটা তিনি করেন একমাত্র ঈসা নবী (আ:)-এর জন্মোপলক্ষেই, অন্য কোনো কারণে নয়। রওয়ায়াতটি এ রকম – “অতঃপর তিনি এমন এক দেশে পৌঁছুলেন, যেখানে শাম (সিরিয়া)-এর প্রাসাদগুলো তাঁর সামনে দৃশ্যমান হলো। জিবরাইল আমীন (আ:) তাঁকে বল্লেন, ‘এখানে নামুন এবং প্রার্থনা করুন।’ হুযূর পূর নূর (দ:) তা করলেন এবং আবার বোরাকে উঠলেন, আর ওই বাহন বিদ্যুৎ গতিতে উড্ডীন হতে থাকলো মহাশূন্যে। এমতাবস্থায় জিবরাইল আমীন (আ:) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনি কোথায় প্রার্থনা করেছেন তা জানেন কি?’ রাসূলুল্লাহ (দ:) ‘না’ বলার পরে ওই ফেরেশতা তাঁকে বল্লেন, ‘আপনি বায়ত-এ-লাহ্‌ম স্থানটিতে প্রার্থনা করেছেন, যেখানে হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ:) জন্মেছিলেন’।” এটা একটা দীর্ঘ হাদীসের অংশ, যা হযরত আনাস (রা:) থেকে সহীহ্ সনদে বর্ণনা করেছেন ইমাম নাসাঈ; আর হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস (রা:) থেকে বর্ণনাটিকে বিশুদ্ধ হিসেবে ঘোষণা করে রওয়ায়াত করেন ইমাম বায়হাকী তাঁর ‘দালাইল আন্ নুবুওয়া’ পুস্তকে (২:৩৫৫-৩৫৭); এ ছাড়াও আত্ তাবারানী নিজ ‘আল-কবীর’ গ্রন্থে এবং সহীহ্ সনদে আল-বাযযারও এটা বর্ণনা করেন যা সমর্থন করেন আল-হায়তামী তাঁর ‘মজমাউল যাওয়াইদ’ কেতাবে এবং ইবনে হাজর স্বরচিত ‘মোখতাসার যাওয়াইদ মুসনাদ আল-বাযযার’ পুস্তকে (১:৯০-৯১ #৩২)। দ্বিতীয়তঃ যীশু খৃষ্টের জন্মদিন উদযাপন প্রাথমিক যুগের খৃষ্টান চার্চ কর্তৃক আদিষ্ট ‘ছিল’, যদিও বা এই প্রথার

সাথে পৌত্তলিক যুগের শীতকালীন অয়ন উদযাপনের ঐতিহাসিক নিকটবর্তিতাকে পৌত্তলিক জনবহুল এলাকাসহ নির্দিষ্ট কয়েকটি অঞ্চলে চালু থাকা সামাজিক নানা প্রথার পুনঃপরিবেশনের মাধ্যমস্বরূপ রাজনৈতিক কর্ণধাররা গ্রহণ করেছিল। তৃতীয়তঃ একটি শরীয়তের আইনী সিদ্ধান্ত বের করা বা না করার উদ্দেশ্যে বিকৃত হওয়া শাস্ত্রলিপি থেকে উদ্ধৃতি দ্বারা প্রামাণ্য দলিল উপস্থাপনের চেয়ে ঠুনকো যুক্তি আর কী-ই বা হতে পারে? মুফতী তকী উসমানী কি একজন খৃষ্টান বা ইহুদী, যিনি খৃষ্টান বা ইহুদী সমাজের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন?

১০/ – "ইসলাম ধর্মের মৌলিক উৎসেও আমরা জন্মদিন উদযাপন বা ইনতেকাল বার্ষিকী পালনের কোনো নির্দেশনা পাই না। রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর হায়াতে জিন্দেগীতে তাঁর অনেক সাহাবী (সাথী) বেসাল তথা খোদার সাথে পরলোকে মিলনপ্রাপ্ত হন। তাঁর প্রিয় স্ত্রী সাইয়্যেদা খাদিজা (রা:) মক্কায় বেসালপ্রাপ্তা হন। তাঁর শ্রদ্ধেয় চাচা হযরত হামযা (রা:)-কে ওহুদের জ্বেহাদে নৃশংসভাবে শহীদ করা হয়। কিন্তু মহানবী (দ:) কখনোই তাঁদের জন্মদিন বা বেসাল বার্ষিকী পালন করেন নি; তাঁর সাহাবী (রা:)-বৃন্দকেও তিনি রবিউল আউয়াল মাসে তাঁর নিজের বেলাদত (তথা ধরাধামে শুভাগমন) দিবস উদযাপনের পরামর্শ দেন নি।"

মন্তব্য: মুফতী তকী উসমানীর ওপরের বক্তব্য সুন্নাহ সম্পর্কে আবারও তার (মতো নামী-দামী লেখকের) আজব, বরঞ্চ দুঃখজনক অজ্ঞতা পরিস্ফুট করে। আমরা ইতোমধ্যেই সাবেত (প্রমাণ) করেছি যে বিশ্বনবী (দ:) সোমবার দিন রোযা রেখে নিজের মীলাদ উদযাপন করতেন। [অনুবাদকের নোট: মীলাদবিরোধীরা দাবি করে যে নবী পাক (দ:) তাঁর মীলাদ পালন করতে আমাদের আদেশ দেন নি। আসলে তিনি আমাদেরকে সার্বিকভাবে আদেশ দিয়েছেন, 'আলাইকুম বি সুন্নাতী', অর্থাৎ, 'আমার সুন্নাহ বা রীতি-নীতি তোমাদের জন্যে পালনীয় (আদেশ)।' সুন্নাহ ৩ প্রকার: (১) সুন্নাতে কওলি বা হুযূর পাক (দ:)-এর পবিত্র মুখ-নিঃসৃত বাণী; (২) সুন্নাতে ফে'লি বা তাঁর কাজ-কর্ম/আমল এবং (৩) সুন্নাতে তাকরীরি বা এমন সব কাজ যা তাঁর সামনে করা হয়েছে কিন্তু তিনি তা মানা করেন নি। মীলাদুন্নবী (দ:) উদযাপনের উদ্দেশ্যে সোমবার রোযা রাখা তাঁর দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত সুন্নাহ। যেহেতু আল-বোখারীসহ সহীহ হাদীসের গ্রন্থগুলোতে উদ্ধৃত হয়েছে যে তাঁর সুন্নাহ আমাদের পালন করা বিধিবদ্ধ হয়েছে, সেহেতু মীলাদুন্নবী (দ:) উদযাপন তাঁর ওই সার্বিক আদেশের আওতায় পড়ে।] ইন্তেকাল বার্ষিকীর প্রসঙ্গে বলতে হয়, হুযূর পাক (দ:) নিশ্চয় নিশ্চয় তাঁর মা হযরত আমেনা (রা:)-এর কবর শরীফ যেয়ারতের পাশাপাশি তাঁর পবিত্র স্ত্রী ও শ্রদ্ধেয় চাচার মাযার-রওযাও যেয়ারত করতেন। আল-বায়হাকী বর্ণনা করেন যে মহানবী (দ:) নিয়মিত প্রতি বছর ওহুদের জ্বেহাদে শহীদ সাহাবীবৃন্দের মাযার-রওযা যেয়ারত করতে যেতেন – 'আ'লা রা'সি কুল্লি হাওল'। [অনুবাদকের নোট: এই যেয়ারতে সফর করতে হতো, কেননা ওই মাযার-রওযা মদীনার বাইরে। অতএব, এতে যেয়ারত নিয়্যত করে সম্পন্ন করার বিষয়টি সপ্রমাণিত হয়] আল-বায়হাকী নিজ 'শুআব আল-ঈমান' (৬:২০১ #৭৯০১) গ্রন্থে আরও বর্ণনা করেন যে মহানবী (দ:) এরশাদ ফরমান: "যে কেউ প্রতি শুক্রবার তার পিতা-মাতা

কিংবা তাঁদের কোনো একজনের কবর যেয়ারত করলে তাকে ক্ষমা করা হবে এবং (তার নাম) পুণ্যবান পুত্র সন্তানদের সাথে লেখা হবে” (মান যায়ারা কাবরা আবাওয়াইহী আও আহাদিহিমা ফী কুল্লি জুমু’আহ গুফিরা লাহু ওয়া কুতিবা বাররান)। বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ (দ:) হলেন নিঃসন্দেহে সকল পুণ্যবান পুত্রদের মাঝে সেরা পুত্র সন্তান। অধিকন্তু, আল-বাযযার বর্ণনা করেন যে সরকারে দো জাহান (দ:) তাঁর পবিত্র স্ত্রী সাইয়্যেদা খাদিজা (রা:) যে স্থানে মাযারস্থ, মক্কার সেই জান্নাত আল-মা’লা কবরস্থান যেয়ারত করেন এবং পুরো জায়গাটাকে আশীর্বাদধন্য কবরস্থান হিসেবে অভিহিত করেন: ‘নি’মা আল-মাকবারাহ হাযিহী’। ইমাম জা’ফর সাদেক (রহ:) নিজ সনদে ইমাম হাসান ইবনে আলী (রা:) থেকে রওয়ায়াত করেন যে হুযূর পাক (দ:)-এর প্রিয় কন্যা হযরত মা ফাতেমা (রা:) প্রতি জুম’আ দিবসে তাঁর শ্রদ্ধেয় চাচা হযরত হামযা ইবনে আবদিল মোত্তালিব (রা:)-এর মাযার য়েযারতে যেতেন, যে মাযার তিনি চেনার জন্যে একটি পাথর দ্বারা চিহ্নিত করে রেখেছিলেন এবং যেখানে তিনি দোয়া ও কান্নাকাটি করতেন। এই বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন আবদুর রাযযাক নিজ ‘মোসান্নাফ’ গ্রন্থে, আল-বায়হাকী তাঁর ‘সুনান’ পুস্তকে, আল-হাকিম এর সনদকে সহীহ ঘোষণা করে স্বরচিত ‘মোসতাদরাক’ কেতাবে, এবং ইবনে আব্দিল বারর নিজ ‘আত্ তামহিদ’ গ্রন্থে।

১১/ – “এ ধরনের উৎসব পরিহার করার কারণ হলো এগুলো মানুষের মনোযোগ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে সরিয়ে কেবল কিছু আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত রাখে। প্রারম্ভে (হয়তো) কোনো পুণ্যবান ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের আন্তরিক উদ্দেশ্য নিয়ে এবং খুব নেক আমল সহকারে এ সব উৎসব প্রবর্তন করা হতে পারে।”

মন্তব্য: ওপরের এই বক্তব্য অনুমান মাত্র, আর তাই এখানে এর কোনো স্থান নেই। শেষের বাক্যটিকে মুহাম্মদ ইবনে আব্দিল ওয়াহহাবের ‘কিতাবুত্ তওহীদ’ শীর্ষক পুস্তিকার হুবহু অনুকরণ মনে হয়েছে।

দ্বীনী ভাই আহমদের এমএসএ-ইসি মেইল-লিস্ট ১১ই জুলাই, ২০০০ সালের মন্তব্য নিম্নরূপ: দেওবন্দী উলামাবর্গ ‘দারুল উলূম দেওবন্দ মাদ্রাসার ১০০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করেন; সেখানে শাড়ী পরে ইন্দিরা গান্ধী উপস্থিত হন। ইন্দিরা মঞ্চে উপবিষ্ট হলেও শত শত আলেম মাটিতে বসেছিলেন। এটা কি ইসলামী প্রথা? প্রাথমিক যুগের মুসলমানবৃন্দ ইসলাম ধর্মের শত বছরের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করেন নি, যা দারুল উলূম দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আপনাদের (অর্থাৎ, দেওবন্দীদের) মতে, আমাদের নবী করীম (দ:) নাকি জন্মদিন ও বার্ষিক অনুষ্ঠান উদযাপন করেন নি। দেওবন্দী আলেম-উলেমা যদি নিজেদেরকে

সুন্নাহের প্রকৃত অনুসারী বলে দাবি করে থাকে, তাহলে কেন তারা দারুল উলূম দেওবন্দের ১০০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করেছিলেন? এটা কি বেদআত ছিল না?

১২/ – "তবু অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে এই (মীলাদুন্নবী) উৎসবকে শেষমেশ (কেবল) আনন্দ-ফুর্তির সাথে মিলিয়ে ফেলা হয় এবং তা ধর্মনিরপেক্ষ উৎসবের সাথে তালগোল পাকিয়ে যায়; আর ওই ধর্মনিরপেক্ষতা ও অধিকাংশ সময় পাপ কাজ এই উৎসবকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে থাকে। [পরবর্তী প্যারাগ্রাফ:] ক্রিসমাসের (বড়দিনের) উদাহরণ আবারও এখানে প্রাসঙ্গিক হবে।"

মন্তব্য: মুফতী তকী উসমানীর ওপরের বক্তব্য প্রতীয়মান করে শরীয়তের মৌলনীতি থেকে কতোটুকু বিচ্যুতি কোনো ব্যক্তির ঘটতে পারে যদি অনুমান ও নিজস্ব অঞ্চলে কোনো মন্দ বিষয়ের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় বা তা প্রত্যক্ষ করার মতো ব্যক্তিগত বা আঞ্চলিক অজুহাত ইত্যাদি বিবেচনার ক্ষেত্রে লাগাম ছেড়ে দেয়া হয়। মৌলিক সুন্নাহ-তে কি মুফতী সাহেব কখনোই 'খুশি প্রকাশ' সম্পর্কে শোনেন নি? তিনি যা কল্পনা করছেন, মহানবী (দ:) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম (রা:) কিন্তু সে রকম কঠোর ও সমালোচনামুখর স্বভাবের অধিকারী ও গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন না, যদিও বা তাঁরা ধরণীর বুকে পদচারণাকারী সবচেয়ে সম্মানিত প্রজন্ম। তাঁরা হাসতে এবং আনন্দ করতে জানতেন, এবং তাঁদের ভাল রসজ্ঞান-ও ছিল।

মুসলমানদের প্রসঙ্গে কিছু বলার সময় মুফতী সাহেবের 'ক্রিসমাসের উদাহরণ' পেশ করার ব্যাপারটি মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। 'সোসাইটি-রেলিজিয়ন-ইসলাম' নামের একটি নিউজ-গ্রুপের প্রসিদ্ধ লেখক আবদুর রহমান লোম্যাক্স ২২শে সেপটেম্বর ১৯৯৬ তারিখের 'প্রসঙ্গ: আল-মাওলিদ (৬/৭): আরও বাজে' শিরোনামে তাঁর একটি লেখায় বলেন: "টুসন শহরে আমার উদযাপিত প্রথম ঈদুল ফিতরের কথা মনে পড়ে। এটা ছিল বেশির ভাগই ছাত্রদের একটি কমিউনিটি, তবে টুসন শহরে এরিজোনা ইউনিভার্সিটির অধ্যাপকবৃন্দ সহ কিছু বয়স্ক মুসলমানও এতে শরীক হন। আমার স্পষ্ট মনে পড়ে এ সব পরিবারের কয়েকটির ১০-১২ বছর বয়সী মেয়েরা টেবিলের ওপর উঠে প্রায় সবার উৎসাহে নাচতে থাকে, আর পাবলিক এড্রেস সিসটেমের মাধ্যমে ড্রাম-বাদ্য বাজতে থাকে। এটা মাওলিদ ছিল না, বরং ছিল ঈদুল ফিতর! সময়ের পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়টি আমার কাছে পরিষ্কার নয় যে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমি যে সব পরিমিত ও সুশৃঙ্খল ঈদ দেখেছি তা আমার দেখা ওই প্রথম ঈদের চেয়ে প্রকৃত সুন্নাহের নিকটবর্তী কিনা। আমি এ ব্যাপারে প্রাসঙ্গিক হাদীসের উদ্ধৃতি দেয়ার ভার অন্যদের প্রতি অর্পণ করছি; তবে এ কথা বলা যথেষ্ট হবে যে মহানবী (দ:) দৃশ্যতঃ ঈদের দিনে 'মজা' করার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন এবং নাচ ও অন্তত কোনো এক ধরনের সঙ্গীতকে বাস্তবিকই উৎসাহ যোগানো হয়েছিল।" মুফতী তকী উসমানীর ওপরের উদ্ধৃতির যুক্তি অনুসরণ করে যদি ঈদ সম্পর্কিত এই

'বাজে' প্রদর্শনীর সাক্ষ্য পর্যাপ্ত পাওয়া যেতো, তাহলে ঈদ উৎসবকে সামগ্রিকভাবে অথবা অস্থায়ী ও স্থানীয়ভাবে নিষিদ্ধ করতে হতো। কিন্তু কোনো কিছুর পক্ষে বা বিপক্ষে (শরয়ী) সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন ঘটনা কখনোই প্রামাণ্য দলিল হতে পারে না।

১৩/ – "রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর বিদায় হজ্জ্বের সময় পবিত্র কুরআন মজীদে আল্লাহতা'লা ঘোষণা করেন: 'আল্ এয়াওমা আকমালতু লাকুম দ্বীনাকুম' (আজ তোমাদের ধর্মকে তোমাদেরই জন্যে পূর্ণ করে দিলাম)' [আল-মায়েদা, ৫:৩]। [পরের প্যারাগ্রাফ:] এর অর্থ হলো ইসলাম ধর্মের সকল শিক্ষা মুসলমানদের জানানো হয়েছে কুরআন মজীদ ও মহানবী (দ:)-এর সুন্নাহ মারফত। কাউকে-ই ধর্মের মধ্যে ওর অংশ হিসেবে কোনো কিছু সংযোজন করার অনুমতি দেয়া হয় নি। হুযূর পাক (দ:)-এর হায়াতে জিন্দেগীর সময় যা দ্বীনের অংশ ছিল না, তা কখনোই এর অংশ হতে পারে না। এ ধরনের সংযোজনকে মহানবী (দ:) বেদআত তথা উদ্ভাবন বলেছেন।"

মন্তব্য: পুরো ফতোওয়ার মধ্যে এটাই সবচেয়ে দুর্বল প্যারাগ্রাফ; কেননা এটা বেদআত সংক্রান্ত ওহাবীদের ধারণা হতে ধার করা হয়েছে, যা কোন্ বিষয় বেদআত আর কোনটি নয় তা নির্ধারণে সুন্নী উলামাবৃন্দের জোমহুর (অধিকাংশ)-এর নীতিমালা ও পদ্ধতিকে লঙ্ঘন করেছে। এই প্রধান পদ্ধতিগত উদ্ভাবন সম্পর্কে উলামা-এ-দ্বীন বহু উপকারী প্রকাশনায় স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যেগুলোর সার-সংক্ষেপ আমরা অন্যত্র পেশ করেছি; আর সেগুলো এখানে আবার উপস্থাপন করার স্থান বা প্রয়োজন কোনোটাই দেখছি না। এখানে শুধু (মক্কার) সাইয়্যেদ মোহাম্মদ আলাউইয়ী মালেকী (রহ:)-এর মীলাদবিষয়ক কোনো একটি ফতোওয়া থেকে তাঁর কথা উদ্ধৃত করা যথেষ্ট হবে। তিনি বলেন: "এতে কোনো সন্দেহ নেই যে ওই ধরনের গান, নাচ, কবিতা আবৃত্তি এবং ঢোল (দফ) বাজানো (যেমনিভাবে মূল সুন্নাহতে বিবৃত হয়েছে) মহানবী (দ:)-এর সাথে থাকার আনন্দে করা হয়েছিল; আর তিনিও এই কাজের প্রতি কোনো রকম নিষেধাজ্ঞা আরোপ বা অসন্তুষ্টি প্রকাশ একেবারেই করেন নি। এগুলো হলো খুশি ও বৈধ আনন্দ প্রকাশের সাধারণ একটা পন্থা বা উপায়, আর একইভাবে মহানবী (দ:)-এর বেলাদত তথা ধরণীতে শুভাগমনের উল্লেখমাত্র (সম্মানার্থে) উঠে দাঁড়ানো-ও (তাঁর প্রতি) সৃষ্টিকুলের খুশি প্রকাশের একটি স্বাভাবিক পন্থা; এটা এবাদত, শরয়ী আইন কিংবা সুন্নাহতে উদ্ভাবন নয়।"

উদ্ধৃত আয়াতটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ; এরশাদ হয়েছে – "আজ আমি (আল্লাহ্) তোমাদের ধর্মকে তোমাদের ওয়াস্তে পূর্ণ করে দিলাম এবং আমার নেয়ামত বর্ষণ সুসম্পন্ন করলাম" (৫:৩)। ইবনে আসাকির বর্ণিত এবং আল-সালেহীর প্রণীত 'সুবূলুল্ হুদা' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ কিছু বর্ণনা অনুযায়ী এই আয়াতটি নাযেল হয় নবী করীম (দ:)-এর বেলাদত দিবসে, সোমবার।

১৪/ – “অতএব, ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখটি ধর্মীয় উৎসব হিসেবে পালন করা কুরআন মজীদের কোনো আয়াত অথবা মহানবী (দ:)-এর কোনো সুন্নাহ দ্বারা সমর্থিত নয়।”

মন্তব্য: আল-হামদু লিল্লাহ, ওপরের বক্তব্যে যতো মিথ্যের বেসাতি, সবই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়েছে এ যাবত যে উত্তর লিপিবদ্ধ করেছি, তারই আলোকে।

১৫/ – “এই উৎসব ধর্মের অংশ হলে রাসূলুল্লাহ (দ:) তা পালন করতে আদেশ দিতেন এবং তিনি ও তাঁর আশীর্বাদধন্য সাহাবী (রা:)-বৃন্দ নিজেরাও তা পালন করতেন; অথবা তাঁদের অব্যবহিত পরের অনুসারী মুসলমান সমাজ (প্রজন্ম) অন্ততঃ তা পালন করতেন। কিন্তু ইসলামী ইতিহাসের প্রথম দিককার শতাব্দীগুলোতে এই উৎসব পালনের কোনো নজির খুঁজে পাওয়া যায় না।”

মন্তব্য: এই বক্তব্য অপ্রয়োজনীয় পুনরাবৃত্তি ছাড়া কিছু নয় এবং এর খণ্ডন ইতোমধ্যে করা হয়েছে (৩য় এবং সামনের ২৩ নং উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য)।

১৬/ – “প্রাথমিক যুগের অনেক শতাব্দী পরে কতিপয় রাজা-বাদশাহ ধর্মের কোনো শক্ত ভিত্তি ছাড়াই ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখকে মহানবী (দ:)-এর বেলাদত দিবস হিসেবে পালন আরম্ভ করেন [আল-বালাগ নোট: মওলানা ইউসূফ লুধিনাভীর মতে এটা ছিল ৬০৪ হিজরী]। আর উদযাপিত ওই মওলূদ বা মীলাদ নামের মাহফিলে হুযূর করীম (দ:)-এর ধরাধামে শুভাগমনের ইতিহাস বর্ণনা করা হতো।”

মন্তব্য: শায়খ সাইয়্যেদ মোহাম্মদ আলাউইয়ী মালেকী (রহ:) তাঁর ‘হাওল আল-এহতিফাল বি যিকরাহ আল-মাওলিদ আন্ নববী আশ্ শরীফ’ (১০ম সংস্করণের ১৫ পৃষ্ঠা) শীর্ষক ফতোওয়ায় বলেন: “মহানবী (দ:)-ই সর্বপ্রথম প্রতি সোমবার রোযা রেখে মাওলিদ উদযাপন করেন। কেননা এই দিন ছিল তাঁর পবিত্র বেলাদত, যা সহীহ মুসলিম গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। মহা পবিত্র মীলাদুন্নবী (দ:) উদযাপনের বৈধতার পক্ষে এটাই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও সুস্পষ্ট শাস্ত্রীয় দলিল।”

এ রকম একটি দলিলের আলোকে মওলিদের তারিখ-বিষয়ক ওপরে উদ্ধৃত 'অনেক শতাব্দী পরে কতিপয় রাজা-বাদশাহ মীলাদুন্নবী (দ:) পালন আরম্ভ করেন' মর্মে বক্তব্য কতোটুকু গ্রহণযোগ্য? আর 'এর কোনো শক্ত ধর্মীয় ভিত্তি নেই' মর্মে মিথ্যে দাবিও বা কে বিশ্বাস করবে? এটা কি কোনো বিশ্বস্ত বা নির্ভরযোগ্য ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের কথা, নাকি শুধু এমন কিছু দেরিতে আগমনকারীর অভিমত যারা উলেমাদের মতপার্থক্যের ব্যাপারে এবং শরীয়তের নীতিমালা সম্পর্কে অনবগত।

সমালোচকরা যখন ধর্মের মৌলনীতির আলোকে বৈধ কোনো কিছুকে নাকচ করতে ব্যর্থ হয়, তখন তারা অন্তঃসারশূন্য মতামতের দিকে ঝুঁকে পড়ে; কিন্তু তারা এ ব্যাপারে একেবারেই অনবধান যে মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের চেয়েও বিশ্বস্ত ও জ্ঞানী মানুষ আছেন। ইমাম যাহাবী তাঁর 'সিয়ার আ'লম আল-নুবালা' (আরনাওত সংস্করণ ২২:৩৩৫-৩৩৬) গ্রন্থে লিখেন: "(ইরবিলের রাজা) মোজাফফর শাহ্ দান-সাদাকা করতে পছন্দ করতেন.তিনি গরিব ও অসুস্থদের জন্যে চারটি সরাইখানা নির্মাণ করেন। ...আর মহিলাদের জন্যে একটি ঘর, এয়াতিমদের জন্যেও একটি ঘর, অপর ঘরটি গৃহহীনদের জন্যে তিনি নির্মাণ করেন; তিনি অসুস্থদের নিজেই দেখতে যেতেন। .তিনি শাফেয়ী ও হানাফী মযহাবের শিক্ষার্থীদের জন্যে একটি মাদ্রাসা নির্মাণ করে দেন।...তাঁর দেশে কোনো বর্জনীয় বিষয় উদ্ভূত হলে তিনি তাতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতেন। ...পবিত্র মীলাদুন্নবী (দ:) উদযাপনের ক্ষেত্রে তাঁর প্রচেষ্টা বর্ণনারও অতীত। মানুষেরা ইরাক ও আলজেরিয়া থেকে বহু দূরের পথ পাড়ি দিয়ে উপস্থিত হতেন। তিনি ও তাঁর স্ত্রীর জন্যে দুটো কাঠের তৈরি মঞ্চ সুশোভিত আকারে স্থাপন করা হতো। ...এই উৎসব বেশ অনেক দিন চলতো; আর বিপুল সংখ্যক গরু ও উঠ জবাই দেয়ার উদ্দেশ্যে এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে রান্নার জন্যে আনা হতো। ..ধর্ম প্রচারকবৃন্দ মাঠে-ময়দানে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে ঘুরে বেড়াতেন। দান-সাদাকায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হতো। বাদশাহর জন্যে ইবনে দিহইয়া 'মাওলিদের কেতাব' সংকলন করেন, যার জন্যে তিনি পান ১০০০ দিনার। মোজাফফর শাহ ছিলেন বিনয়ী, সত্য-ন্যায়ের প্রতি আকৃষ্ট, এবং একজন প্রকৃত সুন্নী মুসলমান, যিনি ফেকাহবিদ ও মুহাদ্দীস উলামাবৃন্দকে পছন্দ করতেন; আর এমন কি তিনি কবিদের প্রতিও ছিলেন সহৃদয়। তিনি কোনো কোনো বর্ণনামতে যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হন।"

অনুরূপভাবে, ইবনে কাসীর নিজ 'আল-বেদায়া ওয়ান্ নেহায়া' (বৈরূত ও রিয়াদ: মাকতাবাত আল-মা'আরিফ ও মাকতাবাত আন্ নাসর, ১৯৬৬ সংস্করণ, ১৩:১৩৬-১৩৭) কেতাবে বলেন: "সুলতান মুজাফফর রবিউল আউয়াল মাসে পবিত্র মীলাদুন্নবী (দ:) উদযাপন করতেন এবং বড় উৎসবেরও আয়োজন করতেন। তিনি ছিলেন জ্ঞানী শাসক, সাহসী ও দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, বুদ্ধিমান, বিদ্বান, এবং ন্যায়বান বাদশাহ। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন এবং তাঁর কবরকে মর্যাদাবান

করুন। শায়খ আবু আল-খাত্তাব ইবনে দিহইয়া বাদশাহের জন্যে মীলাদুন্নবী (দ:)-বিষয়ক একটি বই সংকলন করেন এবং নাম দেন 'আত্ তানবীর ফী মাওলিদিল্ বাশিরিন্ নাযির' (সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারীর শুভাগমনের আলোকধারা)। এতে বাদশাহ তাঁকে ১০০০ দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) উপহার দেন। এক *গৌরবোজ্জ্বল ও অনিন্দনীয় জীবন* যাপনশেষে মোজাফফর শাহের শাসনের সমাপ্তি ঘটে তিনি যখন আককা নগরী (ফিলিস্তিন রাজ্যে)-তে ফরাসীদের প্রতি অবরোধ দিয়েছিলেন ৬৩০ হিজরী সালে।"

ওপরের উদ্ধৃতি থেকে 'মজলিশে উলামা', আরও সুনির্দিষ্টভাবে বল্লে 'আল-জুহালা' সংস্থাটির নিম্নের বক্তব্যের নির্লজ্জ ঔদ্ধত্য সম্পর্কে বিচার করা যায়; তারা বলে,

"এটি একটি প্রথার রক্ষণাবেক্ষণ যা উৎসারিত হয়েছে অধার্মিক ব্যক্তিবর্গ থেকে। এই প্রবন্ধের অন্যত্র ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে মীলাদ যারা প্রবর্তন করেছিল, তারা অধার্মিক লোক ছিল। আমাদের নবী (দ:)-এর ৬০০ বছর পরে ইরবিলের অধার্মিক রাজা অধার্মিক বিদ্বান ব্যক্তিবর্গের সাহায্য-সহযোগিতায় এই প্রথাটি উদ্ভাবন ও প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে এই মীলাদ অনুষ্ঠান যারা আয়োজন করে থাকেন এবং যারা তাতে অংশগ্রহণ করেন, বস্তুতঃপক্ষে তারা উভয়েই অসৎ লোকদের দ্বারা প্রবর্তিত প্রথাকে প্রতিষ্ঠার কাজে সহায়তা করছেন। তারা ইসলামী শরীয়তের সাথে পুরো সাংঘর্ষিক একটা প্রথাকে লালন-পালনের ক্ষেত্রে সহায়তা করছেন এবং এই দুষ্কর্মে নিজেদেরকে সহযোগী হিসেবে জড়াচ্ছেন। দ্বীনের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই এমন লোকদের দ্বারা প্রবর্তিত রীতি ও প্রথা রক্ষণাবেক্ষণ করা ও উৎসাহ দান করা একটা বড় অপরাধ; এটা আরও বেশি প্রযোজ্য যখন এই সব রীতি ও প্রথা হয়ে দাঁড়ায় অনৈসলামী বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণ।"

লক্ষ্য করুন, তারা কীভাবে প্রথমে একটি মিথ্যে দিয়ে আরম্ভ করে এবং সমাপ্তি টানে আরও বড় মিথ্যে দিয়ে, যা শুরু হয় সুলতান মোজাফফর শাহ ও উম্মতের উলেমাবৃন্দকে 'অধার্মিক' আখ্যা দিয়ে এবং শেষ হয় এ কথা দিয়ে – 'তাঁদের ধর্মের সাথে কোনো সম্পর্ক ছিল না।' এটা কি মিথ্যেবাদীদের মাথার ওপর অবতীর্ণ আল্লাহর লা'নত বা অভিসম্পাত নয়?

তবে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ইবনে কাসীর স্বয়ং হাদীসসমৃদ্ধ, রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর প্রতি আবেদন-নিবেদনসম্বলিত এবং তাঁর প্রতি উৎসর্গিত পদ্যে ভরপুর একখানি মওলিদবিষয়ক বই রচনা করেছিলেন। এর নাম 'মাওলিদে রাসূলিল্লাহ' (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)। এটা সালাহউদ্দীন আল-মুনাজ্জিদ কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয় (বৈরূত; দারুল কেতাব আল-জাদিদ, ১৯৬১ সংস্করণ)।

১৭/ – “মহানবী (দ:)-এর জন্মদিন ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে উদযাপন ইসলামী শিক্ষাসমূহে ভিত্তিহীন একটি বেদআত-ই শুধু নয়, তাঁর জন্মদিনের এটা সঠিক তারিখ কিনা তা নিয়েও সংশয় রয়েছে।”

মন্তব্য: মুফতী তকী উসমানী ১ম প্যারাগ্রাফে যা লিখেছেন, এখানে তিনি তার বিরোধিতা করছেন। তিনি লিখেছিলেন: ”ইসলামের ইতিহাসে রবিউল আউয়াল মাস সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা, এই মাস মহানবী (দ:)-এর বেলাদত (ধরণীর বুকে শুভাগমন) দ্বারা আশীর্বাদপুষ্ট।” এটা কি 'ইসলামী শিক্ষাসমূহে একটি ভিত্তি' রচনা করে না? কেননা, মুফতী সাহেব স্বয়ং (১ম উদ্ধৃতিতে) একে ওই ধরনের একটি ভিত্তি মনে করেন, আর এ তো তার নিজেরই কথা। উল্লেখিত ১২ তারিখ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে রাজাব হাম্বলীর এতদসংক্রান্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট হবে; তিনি তাঁর 'লাতা'ইফ আল-মা'আরিফ' (১৮৫ পৃষ্ঠা) পুস্তকে বলেন: “বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ (উলেমা) এই মত পোষণ করেন যে মহানবী (দ:) সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনে তথা আল-এসনাইন (সোমবার)-এ 'হস্তীর বছরের' ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে ধরাধামে শুভাগমন করেন।”

অতএব, এই দিবস উদযাপনের এটা একটা ভাল তারিখ, কেননা মুসলমানদের মস্তিষ্ক ও অন্তরে এর প্রতি ব্যাপকতর প্রস্তুতি এ সময় বিরাজ করে। আর এর পাশাপাশি সাইয়্যেদ মোহাম্মদ আলাউইয়ী মালেকী মক্কী (রহ:)-এর ভাষায় বলা যায়, “আমরা দাবি করি না যে মীলাদুন্নবী (দ:) কোনো সুনির্দিষ্ট রাতে উদযাপন করা সুন্নাত, বরং রাসূলুল্লাহ (দ:)-কে আমাদের সব সময়ই স্মরণ করতে হবে।..এতদসত্ত্বেও ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে তা উদযাপনের যুক্তি আরও শক্তিশালী এই কারণে যে ওই সময় মানুষের মনোযোগ ও অনুভূতি এদিকেই ধাবিত হয়।” [শায়খ সাইয়্যেদ মোহাম্মদ আলাউইয়ী মালেকী কৃত 'মাফাহিম' (১০ম সংস্করণের ৩১৭ পৃষ্ঠা)]

১৮/ – “বিভিন্ন বর্ণনায় ভিন্ন ভিন্ন তারিখের কথা বলা হয়েছে, আর সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রকৃত উলেমাবৃন্দ এই মত পোষণ করেছেন যে হুযূর পাক (দ:) ৯ই রবিউল আউয়াল তারিখেই দুনিয়াতে তশরীফ এনেছিলেন।”

মন্তব্য: ওপরের এই উদ্ধৃতি আরেকটি অর্ধ-সত্য কথা, যা মীলাদুন্নবী (দ:) ১২ তারিখ হবার ব্যাপারে বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামাবৃন্দ একমত মর্মে ইমাম ইবনে রাজাবের বর্ণনার আলোকে

প্রতিভাত হয়। এটা আল-সালেহীর প্রণীত 'সুবূলুল্ হুদা' (১:৪০৩) গ্রন্থেও বিবৃত হয়েছে। উপরন্তু, মুফতী সাহেবের 'সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রকৃত উলামাবৃন্দ' – কথাটি দ্বারা তিনি দৃশ্যতঃ তিনজন সমসাময়িক ব্যক্তিকে বুঝিয়েছেন: ড: আবুল হাসান আলী নদভী, মিসরীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী মাহমূদ বাশা, এবং মোহাম্মদ সুলাইমান মনসুরপুরী; শেষোক্ত দু'জন আল-নদভীর 'আল-সীরাহ আল-নববীয়্যা' (৯৯ পৃষ্ঠা) পুস্তকে পাদটীকা লিখেছেন।

সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামাবৃন্দ যে বিষয়কে সত্য ও সঠিক বলে ঐকমত্য পোষণ করেছেন, তাকে অশ্রদ্ধা বা তাচ্ছিল্য করা প্রকৃত উলামাদের আদব (শিষ্টাচার) নয়, যেমনটি ফুটে উঠেছে আমাদের শিক্ষক ড: নূরুদ্দীন 'এতরের পরিমার্জিত, পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনী-ধারায় তাঁরই রচিত 'আল-নাফাহাত আল-'এতরিয়্যা ফী সীরাতে খায়রিল্ বারীয়্যা' (৫-৬ পৃষ্ঠা) শীর্ষক মীলাদবিষয়ক গ্রন্থে, যেখানে তিনি উভয় তারিখই উল্লেখ করেন: "কতিপয় ইমামের গবেষণানুযায়ী নবী করীম (দ:)-এর বেলাদত ৯ই রবিউল আউয়াল; আর উম্মতের 'আল-মাশহূর' তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামদের মতে এই তারিখ ছিল ১২ই রবিউল আউয়াল।" মরক্কোর তানালত্ (দক্ষিণ মরক্কোর গ্রেট এ্যাটলাস্ চেইন)-এর শায়খ আল-দাদিসী মোহাম্মদ আল-গ্বালী নিজ 'লাফত আল-আনযার ইলা কুররাত আল-আবসার ফী সীরাত আল-মুশাফফা' আল-মুখতার' (৩৮-৩৯ পৃষ্ঠা) শীর্ষক সীরাত সংকলনে ৯ তারিখের কথা উল্লেখও করেন নি; তিনি লিখেন: "আল-এসনাইন (সোমবার) দিনে, সবচেয়ে আলোকোজ্জ্বল মাসের ৩য় অথবা ১২তম কিংবা ৮ম তারিখে (বেলাদত হয়েছে)।" হাদীসবেত্তা আল-সালেহীও সকল সীরাহ-বিষয়ক তাঁর 'সুবূল আল-হুদা ওয়াল্ রাশাদ ফী সীরাতে খায়র আল-'এবাদ' শীর্ষক বিশ্বকোষে ৯ তারিখের কথা উল্লেখ করেন নি, কেবল উলামাদের মধ্যকার জোরালো মতের ক্রমানুসারে ১২, ৮, ১০ [আয্ যাহাবী নিজ 'সিয়্যার' গ্রন্থে (১:২১) তাঁর শিক্ষক আবু মোহাম্মদ আল-দিমইয়াতীর মতানুসারে এই তারিখ পছন্দ করেন], ২য়, ১৭, ১৮, কিংবা ১লা রবিউল আউয়ালকে উল্লেখ করেছেন।

এ ছাড়াও সকল তারিখের চেয়ে ১২ তারিখকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন ড: মোহাম্মদ আবু শোহবা তাঁরই প্রণীত ১৪০০ পৃষ্ঠাসম্বলিত 'আল-সীরাহ আল-নববীয়্যা' (১:১৭৩) গ্রন্থে; অপর দিকে ড: সাঈদ রামাদান আল-বুতী স্বরচিত 'ফিকহ আল-সীরাহ আল-নববীয়্যা' গ্রন্থে (১০ম সংস্করণে) একমাত্র ১২ তারিখকেই চিহ্নিত করেছেন। তাহলে দায়িত্বহীনভাবে দাবিকৃত ওই 'সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রকৃত উলেমা'-রা কোথায়? নাকি ১২ তারিখকে সমর্থনকারী উপরোক্ত উলামাবৃন্দের সবাই ভুয়া তথা জালিয়াত?

অধিকন্তু, মুফতী সাহেব নিজেই শুরুতে তার ১ম উদ্ধৃতিতে স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, "ইসলামের ইতিহাসে রবিউল আউয়াল মাস সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা, এই মাস মহানবী (দ:)-এর

বেলাদত (ধরণীর বুকে শুভাগমন) দ্বারা আশীর্বাদপুষ্ট।" অথচ সুন্নাহ-তে বর্ণনান্তরে আরও যে মাসগুলোকে বেলাদতের ক্ষেত্রে চিহ্নিত করা হয়, সেগুলো হচ্ছে সফর, রজব, রমাযান, এবং রবিউস্ সানী; এর জন্যে দেখুন – ইবনে রাজাব কৃত 'লাতা'ইফ' (১৮৪ পৃষ্ঠা) এবং আল-হায়তামী প্রণীত 'আল-মিনাহ আল-মক্কীয়া (১:১৮১)। কোন্ মাসে হুযূর পূর নূর (দ:)-এর পবিত্র বেলাদত হয়েছে উলেমাদের এতদসংক্রান্ত মতান্তর যদি মুফতী তকী উসমানী না জেনে থাকেন, তাহলে হয়তো বেলাদত দিবস ও অন্যান্য বিষয়েও তার পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব আছে। আর যদি তিনি মাসের ব্যাপারে এই মতান্তর সম্পর্কে জেনেই থাকেন, তাহলে কেন তিনি স্পষ্টভাবে রবিউল আউয়াল মাসের কথা বলে ১২ তারিখের কথা উঠতেই এ ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়েন?

১৯/ – "(তারিখবিষয়ক) এই মতপার্থক্য হলো আরেকটি প্রমাণ এই মর্মে যে মীলাদুন্নবী (দ:)-এর দিবস উদযাপন করা ধর্মের কোনো অংশ নয়; নতুবা নির্ভুলভাবে এর সঠিক দিন ও ক্ষণ সংরক্ষণ করা হতো।"

মন্তব্য: এটি আরেকটি একদম মৌলিক ও উদ্ভাবনীমূলক দুটো বিষয়ের সাদৃশ্য বিচারপদ্ধতি-ভিত্তিক অনুমান, যা (কাউকে) ধর্মের সুদৃঢ় ভিত্তিবিহীন ভ্রান্ত ব্যাখ্যার দিকে টেনে নিয়ে যায়; এর সাথে আরও রয়েছে অ-বিদ্বানসুলভ মন্তব্য – 'এটা ধর্মের অংশ নয়' – যাতে করে মীলাদুন্নবী (দ:) পালন অনুমতিপ্রাপ্ত কিনা সে বিষয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় হ্যাঁ অথবা না বলাকে এড়িয়ে যাওয়া যায়। আমাদের যুগে অনেকবার রমাদান ও যিলহজ্জ্ব মাস আরম্ভ হওয়ার সঠিক তারিখ নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে, কিন্তু রোযা ও হজ্জ্ব যে ধর্মের অংশ সে বিষয়ে তো এই মতভেদের কোনো প্রভাব পড়ে নি!

বস্তুতঃ মীলাদুন্নবী (দ:)-এর দিন, মাস এবং (সবচেয়ে জোরালোভাবে) বছরই যে শুধু সার্বিকভাবে গৃহীত তা নয়, বরং মহানবী (দ:) ওই দিনের সুনির্দিষ্ট যে সময়ে ধরণীতে শুভাগমন করেন সেটিও জ্ঞাত: গাউস্ সিদি আবদুল আযীয দাব্বাগ নিজ 'আল-এবরিয' গ্রন্থে অভিমত ব্যক্ত করেন যে মহানবী (দ:) ওই রাতের তিনটি ভাগের শেষটিতে (অর্থাৎ, ৩য় প্রহরে) তাশরীফ আনেন; আর এটি সমর্থিত হয়েছে আল-হাকিমের হযরত আয়েশা (রা:) হতে গৃহীত রওয়ায়াত দ্বারা এবং আত্ তাবারানী, আল-বায়হাকী ও ইবনে আল-সাকানের হযরত ফাতেমা বিনতে আবদিল্লাহ আল-সাকাফিয়্যা হতে গৃহীত বর্ণনা দ্বারা; অবশ্য মুহাদ্দিস (হাদীসবেত্তা) যাইনুদ্দীন আল-ইরাকী নিজ 'আল-মাওরিদ আল-হানি ফীল্ মাওলিদ আস্ সানি' গ্রন্থে 'সিয়্যার' থেকে প্রমাণ পেশ করেন যে দিনের বেলায় বেলাদতের ঘটনা ঘটেছিল; আর 'সুনান' বিবৃত করে যে সময়টি ছিল দুপুর (১২ টা), যা সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রা:)-এর 'মুরসাল' বর্ণনা থেকে জানা

যায়। এর পাশাপাশি ইবনে দিহইয়া ও আয্‌ যারকাশী তাঁর 'শরহ্‌ আল-বুরদাহ' পুস্তকেও অনুরূপ রওয়ায়াত করেন। এই বিষয়ে আল্লাহ-ই ভাল জানেন এবং তাঁর রাসূল (দ:)-ও।

২০/ - "মহানবী (দ:)-এর পবিত্র সীরাহ'র (জীবন-চরিত) বর্ণনা আপনাআপনি-ই একটি পুণ্যের কাজ, যা খোদায়ী রহমত-বরকতের (ঐশী আশীর্বাদের) কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ এর জন্যে কোনো নির্দিষ্ট সময় বা পদ্ধতি নির্ধারণ করে দেয় নি। এই পুণ্যময় কাজ (আমল) সকল মাসে এবং সকল সময়ে করা উচিত।"

মন্তব্য: মুফতী তকী উসমানীর নিজস্ব মানদণ্ড অনুযায়ী ওপরের পরামর্শটুকু বেদআতের একখানা দাওয়াতনামা ছাড়া কিছু নয়, কেননা সীরাহ-বিষয়ক সভা-সমাবেশ (কনফারেন্স) ও আলোচনা (সীরাতুন্নবী মাহফিল!) সুন্নাহ থেকে নিঃসৃত নয়; প্রাথমিক কয়েক শতাব্দীর পুণ্যবান মুসলমানদেরও আচরিত কোনো রীতি এটি নয়! বরঞ্চ সুন্নাহ-তে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে সাহাবা-এ-কেরাম (রা:) দাঁড়িয়ে মহানবী (দ:)-এর শানে পদ্য-কসীদা আবৃত্তি করতেন বা গান গাইতেন, আর তিনি তাঁদেরকে মুক্ত হস্তে দান করতেন, যেমনিভাবে তিনি দান করেছিলেন হযরত কা'আব (রা:), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা:), হযরত হাসসান বিন সাবেত (রা:), হযরত কুররা ইবনে হুবায়র (রা:) প্রমুখ সাহাবীকে।

মুফতী সাহেবের 'এই পুণ্যময় আমল সকল মাসে এবং সকল সময়ে করা উচিত' – দাবিটির অসারতা সকলের কাছে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় তারই আরোপিত নিষেধাজ্ঞার আলোকে, যা দ্বারা তিনি রবিউল আউয়াল মাসে এবং বিশেষভাবে ওই মাসের ১২ তারিখে মীলাদুন্নবী উদযাপন করতে মানা করেছিলেন। অথচ এই দুটো সময়ই 'সকল মাস ও সকল সময়ের' সূচির আওতায় পড়ে!

২১/ – "রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর বেলাদত (ধরণীতে শুভাগমন) পালন বা জীবন-চরিত আলোচনার উদ্দেশ্যে এই ধরনের মাহফিল আয়োজনের জন্যে শরীয়ত পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসকে নির্দিষ্ট করে দেয় নি।"

মন্তব্য: কেউ যদি বার বার মিথ্যে বলে, তা হয়তো আল্লাহ যাদের গোমরাহ (পথভ্রষ্ট) করতে চান তাদের কাছে সত্যে পরিণত হতে পারে, কিন্তু তাঁদের কাছে এটা সত্য হিসেবে গৃহীত হবে না যাঁদেরকে আল্লাহতা'লা বোঝার ক্ষমতা দিয়েছেন।

২২/ – " অতএব, সীরাহ মাহফিলগুলোকে শুধু রবিউল আউয়াল মাসে সীমাবদ্ধ রাখা একটি বেদআত; কিংবা এ কথা বিশ্বাস করাও (বেদআত) যে এই মাসে উদযাপিত মাহফিলগুলো বছরের অন্য কোনো তারিখে পালিত মাহফিলের চেয়ে বেশি সওয়াবদায়ক।"

মন্তব্য: আমরা ইতোমধ্যে বলেছি যে মুফতী সাহেবের পেশকৃত নিজস্ব মাপকাঠি অনুযায়ী মহানবী (দ:)-এর জীবনী আলোচনার মাহফিল একটি বেদআত। কোনো নির্দিষ্ট মাসে এ ধরনের মাহফিল সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয় মর্মে এই নতুন শর্তারোপে পরিদৃষ্ট হয় যে মুফতী সাহেব নির্দ্বিধায় এ সকল মাহফিলকে শরীয়তের অংশ হিসেবে বিবেচনা করছেন; অথচ তিনি নিজেই বলেছিলেন যে আল্লাহতা'লা ইসলাম ধর্মকে পূর্ণ করেছেন এবং এই সকল মাহফিল ধর্মের অংশ হিসেবে মহানবী (দ:)-এর কাছে যেমন প্রকাশিত হয় নি, তেমনি প্রাথমিক যুগের পুণ্যবান মুসলমান প্রজন্ম কর্তৃক আচরিতও হয় নি! অধিকন্তু, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের আকীদা-বিশ্বাসকে যে ব্যক্তি বেদআত বলে আখ্যা দেয় তার অবস্থা (শরীয়তে) কী হিসেবে নির্ধারিত হবে তাই এখন জিজ্ঞাস্য? সুন্নী মুসলমানদের ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে তাঁদেরকে যে সব সম্ভাব্য আইন-প্রণেতা নিজেদের ভ্রান্ত মতবাদ অনুসরণ করতে বলেন, তাদের ক্ষতি থেকে বাঁচার ক্ষেত্রে আল্লাহতা'লাই আমাদের জন্যে সহায় ও (সর্বোত্তম) সাহায্যকারী।

২৩/ – " বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর সাহাবা-এ-কেরাম (রা:) তাঁর জীবনকে স্মরণ করতেন সারা বছর জুড়ে; তাঁরা শুধু তাঁর (প্রতি অবতীর্ণ) ঐশী বাণী অধ্যয়ন বা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ এবং তা অন্যদের কাছে পৌঁছেই দিতেন না, বরং তাঁর জীবন যাপন পদ্ধতিও অনুসরণ করতেন এবং তাঁর শিক্ষাকে নিজেদের প্রতিটি কাজে-কর্মে প্রতিফলনও করতেন; আর এটাই প্রত্যেক মুসলমানের কাছে ইসলাম ধর্মের দাবি।"

মন্তব্য: মুফতী তকী উসমানী ওপরের বক্তব্যে স্বীকার করেছেন যে মহানবী (দ:)-এর পবিত্র জীবনকে স্মরণ করার মৌলনীতি সাহাবা-এ-কেরাম (দ:)-এর মাঝে বিরাজমান ছিল; আর তাই তা বেদআত নয়। তবে তিনি এ কথা উল্লেখ করতে অবহেলা করেছেন, বরঞ্চ জানেন বলে মনে হয় নি যে, সাহাবা-এ-কেরাম শুধু রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর ঐশী বাণী 'শিক্ষা গ্রহণ ও অন্যদের

কাছে পৌঁছেই দিতেন না', তাঁরা তাঁর (প্রকাশ্য) হায়াতে জিন্দেগীতে ও বেসালপ্রাপ্তির পর তাঁরই সম্মানার্থে 'কবিতা আবৃত্তি ও না'ত-শে'রও গাইতেন'!

সম্ভাব্য সমালোচকদের কাছ থেকে অহরহ এমন আপত্তি শোনা যায় এই মর্মে, 'মহানবী (দ:) ও সাহাবা-এ-কেরাম (রা:) বর্তমানের মীলাদুন্নবী (দ:) উদযাপন পদ্ধতি অনুযায়ী কখনোই তা পালন করেন নি'; এই আপত্তি মীলাদ বা অন্য কোনো বিষয়ের বেলায় শরয়ী অবৈধতার দলিল হতে পারে না। এ ব্যাপারে সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ আল-গোমারী তাঁর 'হুসন্ আত্ তাফাহহুম ওয়াল্ দারক লি মাস'য়ালাত আত্ তারক' (কোনো আমল পালন না করার বিষয়ে সঠিক উপলব্ধি) শীর্ষক পত্রে বিস্তারিত আলোকপাত করেন; এটা সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইভিত্তিক 'দারুল আওকাফ' হতে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

২৪/ – "এ দ্বারা আমরা এটা বোঝাই নি যে নবী পাক (দ:)-এর জীবনী আলোচনামূলক মাহফিলগুলো রবিউল আউয়াল মাসে উদযাপন করা যাবে না। মোদ্দা কথা হলো, সেগুলোকে কেবল ওই মাসেই সীমাবদ্ধ করা যাবে না; আর এটাও বিশ্বাস করা চলবে না যে ওই বিশেষ মাসে সেগুলো উদযাপন করতে শরীয়তে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।"

মন্তব্য: যাঁরা রবিউল আউয়াল মাসে মীলাদুন্নবী (দ:) মাহফিল করতে চান, তাঁদেরকে তা করতে দেয়া হোক। আর যাঁরা অন্য কোনো মাসে তা পালন করতে চান, তাঁদেরও তা করতে দেয়া হোক – যেমনি এরশাদ হয়েছে: "এবং এর (তাকওয়া অর্জন তথা খোদায়ী আশীর্বাদের) আকাঙ্ক্ষীরা (তথা সাধকবৃন্দ) যেন এরই আকাঙ্ক্ষা (সাধনা) করেন।" [আল-কুরআন, ৮৩:২৬]

২৫/ – "এটি সচরাচর দেখা যায়, বিশেষ করে পশ্চিমা দেশগুলোতে, মীলাদুন্নবী (দ:)-এর মাহফিলগুলোতে শরীয়তে বিধিবদ্ধ হিজাব তথা পর্দা প্রথা অমান্য করে নারী-পুরুষ এক সাথে বসে। এ ধরনের অবাধ মেলামেশার বিরুদ্ধেই মহানবী (দ:)-এর শিক্ষাসমূহের অবস্থান। শরীয়তের এ রকম মৌলিক শিক্ষার প্রকাশ্য লঙ্ঘন করে কোনো মীলাদুন্নবী (দ:) মাহফিল কীভাবে ফলদায়ক হতে পারে?"

মন্তব্য: উসূল তথা মৌলনীতি অনুযায়ী এ ধরনের দৃষ্টান্ত মীলাদুন্নবী (দ:) অনুষ্ঠানের মূল 'এবাহত' বা বৈধতাকে রহিত কিংবা খর্ব করে না।

দ্বীনী ভাই জনাব আহমদ (১) এমএসএ-ইসি মেইল লিস্ট, ১১ই জুলাই ২০০০ সালে মন্তব্য করেন:

"আল্লামা ইবনে আবেদীন শা'মী (রহ:) বলেন, 'কারো উচিত নয় (আউলিয়া কেরামের) মাযার যেয়ারত শুধু এ কারণে পরিত্যাগ করা যে সেখানে শরীয়তবিরোধী কিছু কাজ সংঘটিত হয়ে থাকে; যেমন – নারী ও পুরুষের মেলামেশা। বস্তুতঃ এই ধরনের অবৈধ কাজের জন্যে 'মুস্তাহাব্বাত' তথা প্রশংসনীয় আমল পরিহার করা উচিত নয়। মানুষের জন্যে মাযার যেয়ারত করা এবং 'বেদআত' বন্ধ করা জরুরি।' [ফতোওয়ায়ে শা'মী: কেতাবুল জানা'য়েয - মাযার যেয়ারত প্রসঙ্গে বর্ণনা]

"আল্লামা শা'মী (রহ:) এখানে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে নারী-পুরুষের মেলামেশা কোনো মোস্তাহাব আমল/কর্মকে হারাম (অবৈধ) বা পরিত্যাজ্য করতে পারে না। মক্কা বিজয়ের আগে কা'বা গৃহে অনেক দেব-দেবীর মূর্তি ছিল, কিন্তু মুসলমান সমাজ প্রতিমার কারণে তাওয়াফ বা উমরাহ পরিত্যাগ করেন নি। হ্যাঁ, আল্লাহতা'লা যখন তাঁদেরকে ক্ষমতা মঞ্জুর করলেন, তখন তাঁরা ওই মূর্তিগুলো অপসারণ করলেন।

"মানুষেরা হজ্জ্বে গমন করলে এয়ারপোর্টে, উড়োজাহাজে, তাওয়াফকালে, মিনায় এবং মুজদালিফায় নারী-পুরুষের সমাবেশ ঘটে, কিন্তু কেউই হজ্জ্ব বন্ধ করে দেন না। মীলাদের মজলিসগুলোতে অন্তত নারী ও পুরুষ আলাদা আলাদা বসেন এবং নারীরা হিজাব পরেন। নেকাহ বা বিয়ের অনুষ্ঠানে নারী-পুরুষের সমাবেশ ঘটে, আর অধিকাংশ নারী-ই শরয়ী হেজাব পরেন না। এমতাবস্থায় 'মজলিসুল উলামা' কি বিয়ের অনুষ্ঠানকে হারাম বলে ফতোওয়া দেবেন? যদি না দেন, তাহলে শুধু মীলাদের মাহফিলগুলোকে হারাম প্রমাণ করতে আপনাদের সমস্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলছেন কেন?"

২৬/ – "কিছু কিছু মাহফিলে পুরুষ শ্রোতাদের সামনে মহিলারা মহানবী (দ:)-এর স্মরণে না'ত-কসীদা কখনো কখনো গানের সুরে গেয়ে থাকেন, যা পুরোপুরিভাবে রাসূলুল্লাহ (দ:)-এর নির্দেশের পরিপন্থী। এ ধরনের মাহফিলের আয়োজন বা তাতে অংশগ্রহণ করা শরীয়তে স্পষ্টভাবে নিষেধ, কেননা এটা শরয়ী আইনের লঙ্ঘনই শুধু নয়, মহানবী (দ:)-এর সীরাহ (জীবনাদর্শ)-এর পবিত্রতার প্রতি অসম্মানও।"

মন্তব্য: পূর্ববর্তী প্যারাগ্রাফে এর জবাব দেয়া হয়েছে। তথাপি আমরা এখানে আরও যোগ করতে চাই যে হুযূর পূর নূর (দ:) জনসমক্ষে ও ব্যক্তিগত প্রেক্ষাপটে অনেকবার মহিলাদের গাওয়া সঙ্গীত (না'ত/শে'র/সেমা) শুনেছেন এবং তাঁদের ওই কাজে বাদ সাধেন নি যতোক্ষণ তা শরয়ী আইনে সিদ্ধ ছিল! ["তবে (ব্যাপার) এই যে তাদের (বাতেলপন্থীদের) চোখগুলো অন্ধ নয়, বরং তাদের অন্তরগুলোই (অন্ধ), যেগুলো তাদের বক্ষগুলোতে নিহিত।" (আল-কুরআন, ২২:৪৬)]

২৭/ – "ঈদে মীলাদুন্নবী (দ:) তথা ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে মিছিল, হুযূর পাক (দ:)-এর রওযা শরীফের নকল (প্রতিকৃতি) তৈরি, ভবন ও সড়কগুলোতে আলোকসজ্জা ইত্যাদি কার্যক্রম শরীয়তের কোনো আইন দ্বারা সিদ্ধ নয়। বরঞ্চ এগুলো অন্যান্য বিশেষ কিছু ধর্মের সচেতন বা অসচেতন অনুকরণমাত্র। ইসলামী ইতিহাসের পূর্ববর্তী যুগে এর কোনো নজির খুঁজে পাওয়া যায় না।"

মন্তব্য: এই একটি মাত্র ফতোওয়ায় মুফতী সাহেবের ইসলামী ইতিহাস, সুন্নাহ, সীরাহ এবং শরীয়তের উসূল (মৌলনীতি)-বিষয়ক জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা আরও প্রকটভাবে দৃশ্যমান হয়েছে। নিম্নে ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শতাব্দী যাবত সর্বসাধারণের উদযাপিত ঈদে মীলাদুন্নবী (দ:) মাহফিলের বিবরণ পেশ করা হলো। উল্লেখ্য যে, মুফতী তকী উসমানী যে সব বিষয় ইসলামের পূর্ববর্তী যুগে বিদ্যমান ছিল না বলে দাবি করেছেন, ওই সব মাহফিলে তার অধিকাংশ উপাদান-ই উপস্থিত ছিল:

* ইবনে জুবাইর (৫৪০-৬১৪) তাঁর 'রেহাল' (ভ্রমণ বৃত্তান্ত)-এর ১১৪-১১৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "রবিউল আউয়াল মাসের প্রতি সোমবার এই বরকতময় স্থান (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ঘর) (সবার জন্যে) খুলে দেয়া হতো, আর মানুষেরা তাতে প্রবেশ করে বরকত আদায় তথা আশীর্বাদ গ্রহণ করতেন (মোতাবাররিকীন বিহী); কেননা এ রকমই এক সোমবারে এবং রবিউল আউয়াল মাসে মহানবী (দ:) ধরণীর বুকে শুভাগমন করেছিলেন।"

* সপ্তম শতকের ইতিহাসবিদ আবুল আব্বাস আল-'আযাফী ও তাঁর ছেলে আবুল কাসেম আল-'আযাফী তাঁদের অপ্রকাশিত 'কিতাব আদ্ দুররা আল-মোনাযযম' শীর্ষক গ্রন্থে লিখেন, "পুণ্যবান হাজ্বী ও খ্যাতনামা পর্যটকবৃন্দ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, মীলাদুন্নবী (দ:) দিবসে মক্কা নগরীতে (দুনিয়াদারীর) কাজ-কর্ম বন্ধ থাকে; কোনো কিছু বেচা-কেনা হয় না; শুধু মানুষেরা মহানবী (দ:)-এর পবিত্র জন্মস্থানের ঘরটিতে ছুটে যান এবং যেয়ারতে ব্যস্ত থাকেন। এই দিন কা'বা ঘর খুলে দেয়া হয় এবং এরও যেয়ারত চলে।"

* প্রখ্যাত অষ্টম শতকের ইতিহাসবিদ ইবনে বতুতা তাঁর 'রিহলা' (১:৩০৯ এবং ১:৩৪৭)-এ বর্ণনা করেন যে প্রতি শুক্রবার জুমু'আ নামাযের বাদে এবং মীলাদুন্নবী (দ:)-এর দিবসে কা'বা গৃহের দ্বার-রক্ষী বণু শায়বা গোত্র-প্রধান আল্লাহর ঘরের দরজা খুলে দেন; আর মীলাদুন্নবী (দ:) দিবসে মক্কার শাফেয়ী কাজী (প্রধান বিচারক) নাজমুদ্দীন মোহাম্মদ ইবনে আল-ইমাম মুহিউদ্দীন আত্ তাবারী মক্কা নগরীর সকল শুরাফা' (মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বংশধর) ও মানুষের মাঝে তবাররুক (খাদ্য) বিতরণ করেন।

* ইতিহাসবিদ ইবনে যাহেরা আল-হানাফী নিজ 'আল-জামেউ' আল-লাতীফ ফী ফদলে মক্কা ওয়া আহলিহা' পুস্তকের ৩২৬ পৃষ্ঠায়, ইমাম ইবনে হাজর আল-হায়তামী মক্কী স্বরচিত 'কেতাব আল-মাওলিদ আশ্ শরীফ আল-মো'য়াযযম' গ্রন্থে, এবং ইতিহাসবিদ আন্ নাহরাওয়ালী তাঁর 'আল-এ'লাম বি আ'লম বায়ত আল্লাহ আল-হারাম' বইয়ের ২০৫ পৃষ্ঠায় বলেন যে প্রতি বছর রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ মাগরেবের নামাযের পরে মক্কাবাসী চারজন কাজী (বিচারক) যাঁরা চার মযহাবের প্রতিনিধি, তাঁরা এবং মক্কার ফুকাহা (ফকীহবৃন্দ), ফুদালা' (সমাজের গণ্যমান্য), মাশায়েখ আল-কেরাম (পীর সাহেবান), যাউইয়্যা শিক্ষকবৃন্দ ও তাঁদের ছাত্রবর্গ, রু'আসা' (ম্যাজিস্ট্রেটগণ) এবং মুতা'আম্মামীন (ইসলামী জ্ঞান বিশারদবৃন্দ)-সহ সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক মানুষ একযোগে মহানবী (দ:)-এর জন্মস্থানের (ঘর) যেয়ারতের উদ্দেশ্যে মসজিদ থেকে বেরিয়ে পড়েন; এই সময় তাঁরা উচ্চস্বরে যিকর ও তাহলিল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) পড়তে থাকেন। যাত্রাপথের ওপর যে সব বাড়ি-ঘর পড়ে, সেগুলো অসংখ্য চেরাগ ও মোমবাতি দ্বারা আলোকসজ্জা করা হয় এবং মানুষেরা সবাই বাসার বাইরে চলে আসেন। তাঁরা তাঁদের সবচেয়ে সুন্দর সুন্দর জামাকাপড়গুলো পরেন এবং নিজেদের বাচ্চাদেরও সাথে নিয়ে আসেন। ওই পবিত্র স্থানে পৌঁছার পর (ঘরের) অভ্যন্তরে মীলাদুন্নবী (দ:)-বিষয়ক এক বিশেষ বয়ান দেয়া হয়, যার মধ্যে উল্লেখিত হয় মহানবী (দ:)-এর ধরণীতে আবির্ভাবের সময়কার মো'জেযা তথা অলৌকিক ঘটনাবলী। অতঃপর সুলতান (অর্থাৎ, খলীফা), মক্কা মোকাররমার আমীর ও শাফেয়ী কাজীর জন্যে দোয়া করা হয় যার মধ্যে সবাই একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করেন। 'এশার নামাযের কিছুক্ষণ আগে পুরো দলটাই মহানবী (দ:)-এর জন্মস্থান থেকে মসজিদে (কা'বায়) ফিরে আসেন। এই সময় তাতে তিল ধারণের ঠাঁই থাকে না। সবাই কাতারবদ্ধ হয়ে মাকাম-এ-ইবরাহীমের পাদদেশে বসে পড়েন। মসজিদের ভেতরে ওয়াযকারী প্রথমে 'তাহমিদ' (আল-হামদু লিল্লাহ) পাঠ করেন এবং তাহলিল-ও, অতঃপর আবারও খলীফা, মক্কার আমীর ও শাফেয়ী কাজীর জন্যে দোয়া করা হয়। এগুলো শেষ হলে 'এশার নামাযের আযান দেয়া হয়। নামাযশেষে সবাই বাড়ি ফিরে যান।

* ওপরের অনুরূপ আরেকটি বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন আদ্ দিয়ারবকরী নিজ সীরাহ-বিষয়ক ‘তারিখ আল-খামিস ফী খবর আনফাসি নাফিস্’ শীর্ষক গ্রন্থে।

২৮/ – “মহানবী (দ:) প্রসঙ্গে যা আসলে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, প্রথমতঃ তাঁর শিক্ষাসমূহ অনুসরণ করা, এবং দ্বিতীয়তঃ তাঁর পবিত্র সীরাহ (জীবনাদর্শ) সকল মুসলমানের কাছে তুলে ধরা, শৈশবকাল থেকে মুসলমানদের অন্তরে তা সংরক্ষণ করা, পরিবার সদস্যদের এ আদর্শে শিক্ষিত করে তোলা যাতে তারা নিজেদের জীবন সেই অনুযায়ী পরিচালনা করতে পারেন, আর এটাকে সারা বিশ্বে প্রত্যক্ষকৃত সেরা মানব আচার-আচরণের উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করা – এগুলোর সবই পরম মহব্বত ও শ্রদ্ধাসহ করতে হবে, যা কেবল কিছু আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হবে না, বরং সুন্নাহের অনুসরণে প্রকৃত আচার-আচরণেও এর বহিঃপ্রকাশ ঘটবে।”

মন্তব্য: মীলাদুন্নবী (দ:)-এর সমাবেশ, কুরআন তেলাওয়াত ও না’ত পরিবেশন, খাবার ও মিষ্টি তবাররূক হিসেবে বিতরণ ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে নীতিগতভাবে এ ছাড়া আর অন্য কিছু-ই নেই, শুধু আছে মহানবী (দ:)-এর শিক্ষাসমূহ অনুশীলন, মুসলমানদের মাঝে তাঁর জীবনাদর্শের বিস্তার, তাঁদের অন্তরে তাঁর প্রতি মহব্বত জাগিয়ে তোলা, এবং দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত ইসলামী রীতি-নীতি অনুযায়ী তাঁদের পরিবার সদস্যদের জীবন যাপনের জন্যে তাদেরকে শিক্ষিত করে তোলার মূলমন্ত্র – “এগুলোর সবই পরম মহব্বত ও শ্রদ্ধাসহ পালনকৃত, যা কেবল কিছু আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত নয়, বরং সুন্নাহের অনুসরণে প্রকৃত আচার-আচরণেও এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে

২৯/ – “এটি শুধু জুলুস-মিছিল ও দেয়ালে আলোকসজ্জা করে পালন করা সম্ভব নয়। এর জন্যে প্রয়োজন নিরবচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিক কর্মপ্রয়াস এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের একটি অর্থবহ কর্মসূচি।”

মন্তব্য: কেউই ওপরের মন্তব্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন না, কিন্তু মুফতী সাহেবের ফতোওয়ার বাকি অংশের বেশির ভাগই ভ্রান্তি ছাড়া কিছু নয়। তাই তা অগ্রাহ্য করতে হবে।

আমাদের আকা ও মওলা হযরতে রাসূলে আকরাম (দ:)-এর প্রতি সালাত-সালাম জানাই; তাঁর আহলে বায়ত ও সাহাবা-এ-কেরাম (রা:)-এর প্রতিও সালাত-সালাম। আর সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের মহাপ্রভু আল্লাহতা’লার জন্যেই বিহিত।

সমাপ্ত